

থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারি রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটি উৎসবের দিন। দুর্গা বলিল—আজ কী হয়েছে জানো মা —

অপু বলিল — যাঃ তাহলে তোর সঙ্গে আড়ি করব, বলে দ্যাখ —

— করগে যা আড়ি— শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ি পোস্তদানা রোদ্দুরে দিয়েচে, ও বল্লে, কী রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ — ও খেয়ে এল মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝতেও পাল্লে না যে পোস্ত — এমন বোকা — না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহার মাকাল ফলগুলো সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সন্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল — কেমন, হলো এখন? বড্ড যে কাঁদছিলি সকালবেলা? সে-সন্ধ্যায় কিসে সে বেশি আনন্দ পাইয়াছিল — মাকাল ফলগুলো হইতে কি, দিদির মুখের বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতাভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে — তাহা সে জানে না।

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল — পাতালকৌড়ের তরকারিটা কী সুন্দর খেতে হয়েছে মা! তাহার মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল — বাঃ! খেতে ঠিক মাংসের মতো, না দিদি? পাতালকৌড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলিনে—। উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যে সর্বজয়ার বুক গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরার্দ নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়।



১৩

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। বেলা দুইটা বা আড়াইটার কম নয়, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ি গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলায় বাখারি চাঁচিতেছিল; অপু বলিল — এই কড়ি খেলবি! খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল তাহাকে এখনি নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে! সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ি। রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল; অপু বলিল — হৃদয় বাড়ি আছে? রামচরণ বলিল... হৃদয় কেন ঠাকুর? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও হৃদে বাড়ি নেই।

ঠিক দুপুরবেলায় ঘুরিয়া অপূর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েক স্থানে বিফল মনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ির নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়া তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়িখেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে, কেবল ব্রাহ্মণপাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপূর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ি, অপূরের বাড়ি হইতে তাহা অনেক দূর। অপূর চেয়ে বয়সে পটু কিছু ছোটো; অপূর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভরতি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল। পটু কড়ির গেঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সূতার বুনা নি ছোটো গেঁজেটি — তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেচি — সাতটা সোনা গোঁটে; হেরে গেলে আরো আনব। ... পরে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল কেমন দেখচিস? গেঁজেটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে; সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক করিয়া বড়ো কড়ি দিয়া তাক ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বারবার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটি ভরতি হইতে আর কত বাকি!

কয়েকজন জেলের ছেলে কী পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল— আর একহাত তফাত থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ বেশি।

পটু বলিল — বারে, তা কেন, টিপ বেশি থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেতো না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল — এত বেশি কড়ি আমি কোনোদিন জিতিনি; আজ আর খেলচি নে, — খেললে কি আর এই কড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারব? আবার একহাত বাধ্ বেশি! সব হেরে যাব। হঠাৎ সে কড়ির ছোট থলিটি হাতে লইয়া বলিল— আমি একহাত বেশি নিয়ে খেলব না, আমি বাড়ি যাচ্ছি। পরে জেলে ছেলেদের ভাবভঙ্গি ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল — তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি? সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্বাহাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না; বিষম মুখে বলিল — বা রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত! — পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল; সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটাই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা! পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড়ো ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারবে! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল— কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু খুশি না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে-ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল — ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও— ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতের ঘুসি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, তারপর ঠেলাঠেলিতে সে ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

বাড়ি ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল— দিদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা কঞ্চি রেখে গিইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু-খণ্ড করে রেখেচিস?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই। — আহা, ভারি তো একখানা বাঁকা কঞ্চি! তোর যত পাগলামি — বাঁশবাগানে খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি! কঞ্চির ভারি অমিল কিনা।

অপু লজ্জিত মুখে বলিল — অমিল না তো কি? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি। আমি কত খুঁজেপেতে নিয়ে আসব, আর তুই সব ভেঙে-চুরে রাখবি— বেশ তো!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল — দেবো এনে যত চাস, কান্না কীসের!

বাঁকা-কঞ্চি অপূর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস! একখানা শুকনো, হালকা, গোড়ার দিক মোটা, আগার দিক সরু, বাঁকা কঞ্চি হাতে করিলেই অপূর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা কঞ্চি হাতে করিয়া এক একদিন সে সারা সকাল কী বৈকাল আপন মনে বাঁশবনের পথে কী নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়, কখনও রাজপুত্র, কখনও তামাকের দোকানি, কখনও ভ্রমণকারী, কখনও বা সেনাপতি, কখনও মহাভারতের অর্জুন — কল্পনা করে এবং আপন মনে বিড়বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেইসব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মতো হালকা হইবে ও পরিমাণ মতো বাঁকা হইবে তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সেরকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।

অপু যে বাঁকা-কঞ্চি হাতে এরকম করিয়া বেড়ায়, একথা কেউ না শুনিতো পারে অপূর সেদিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপন মনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে পারতপক্ষে জনসমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সেসব দিকে না গিয়া নদীর ধারে — নির্জন বাঁশবনের পথে— নিজেদের বাড়ির পিছনে তেঁতুলতলায় ঘোরে। এ অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। ক্লটিং যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনি সে জিভ কাটিয়া হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয় পাছে কেহ কিছু মনে করে — এজন্য তাহার ভারি লজ্জা।

কেবল জানে তাহার দিদি। তাহাকে এ অবস্থায় দু-একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে? তাই সে বাঁকা কঞ্চির কথা দিদিকে স্পষ্টতই জিজ্ঞাসা করিল। অন্য লোক হইলে, লজ্জায় অপু কখনোই এ কথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপূর সহিত বাঁকা-কঞ্চির কী রহস্যময় সম্পর্ক, তবুও অপূর মনে হয় সকলেই সেকথা জানে বলিয়াই সকলে তাহাকে

পাগল বলিয়া ঠাটা করিবে। কে বুঝিবে— একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোনো জনহীন বনের পথে কী অপূর্ব আনন্দেই সারাদিন একা-একা কাটাইয়া দিতে পারে।

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল — মাকে যেন এসব বলিসনে দিদি! দুর্গা বলে নাই। সে জানে, অপু একটা পাগল! ভারি মমতা হয় ওর ওপর, ছোট বোকা আদুরে ভাইটা — এসব মাকে বলিয়া কী হইবে?...



১৪

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাস্কাটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বইয়ের মধ্যে ভালো গল্প লেখা আছে কিনা দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে ‘সর্ব-দর্শন সংগ্রহ’! ইহার অর্থ কী, বইখানা কোন বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না! বইখানা খুলিতেই একখানা কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া উর্ধ্বাশ্বাসে যেরূপে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলোর এই গন্ধটা তাহার বড়ো ভালো লাগে — গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড়ো অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে — কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে একথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,— শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, — আবার পড়িল — আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাস্কাটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে — শকুনির বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের — সতু, নীলু, কানু, পটল, নেড়া — সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচুগাছের মাথায়। তাহার মা বকে— এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে — আশ্চর্য! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ি নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আত্মাণ লয়— সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই— পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, উহা জোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে — আয় শোন অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠা পাতের ভাত লইয়া বাড়ির খিড়কি দোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয় — আয় ভুলো— তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া থাকে, যেন কী অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে — ওই এসেছে! কোথেকে এল দেখলি? — খুশিতে সে হি হি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারি — তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে, আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বকের মধ্যে টিপ টিপ করে, মনে মনে ভাবে — আজ ভুলো আসবে না বোধহয়, দেখি দিকি কোথেকে আসে! আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!—

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতা-পাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির!

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়! বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়। মনে মনে ভাবে— ঠিক শুনতে পায় তো, আসে কোথেকে! আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখব দিকি, তাও শুনতে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চার করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কী আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সম্ভান মিলিল। হিবু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গোরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল — তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেব।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ির সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো কালো রং-এর ছোটো ছোটো ডিম বাহির করিয়া বলিল— এই দ্যাখো ঠাকুর এনিচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি পরে আহ্লাদের সহিত উলটাইতে পালটাইতে বলিল — শকুনির



ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে — কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অস্থকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি — সব। এই এত বড়ো বড়ো সোনাগেঁটে — দেখবি? দেখাব?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপূর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা জোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলো অপূর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনও হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর

বেগুন-বিচি খেলা! ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হালকা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না, ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপন মনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ পাখি ময়না পাখির মতো ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?...

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকে হাঁড়ি-কলসির পাশে গৌঁজা সলিতা পাকইবার ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে হাতড়াইতে কী যেন ঠক করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না, দুর্গা মেঝে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল — ওমা কীসের দুটো বড়ো বড়ো ডিম এখানে! এঃ, পড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে — দেখেচো কী পাখি ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কী ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাতে খাইল না কান্না, হই হই কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে — ছেলেটার যে কী কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনও শুনিনি — শুনো সেজো ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষ উড়তে পারে— ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা বদমায়েসের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোথেকে দুটো কাগের না কীসের ডিম এনে বলেচে — এই নেও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কী বোকা সে আর তোমার কাছে কী বলব সেজো ঠাকুরঝি— কী করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি।

কিন্তু বেচারি সর্বজয়া কী করিয়া জানিবে, সকলেই তো কিছু ‘সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ’ পড়ে নাই বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।



১৫

অনেক দিন হইতে গ্রামের বৃন্দ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপূর বড়ো ভাব। গাঙুলি পাড়ার গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃন্দ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালোবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙুলিদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপূর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত— সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপূ গিয়া বৃন্দের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়, — দাদু আছ? বৃন্দ তাড়াতাড়ি

ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন — এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো —

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না — কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃন্দ্রের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কেচেমিশিয়া থাকে, বৃন্দ্রের সঙ্গে তাহার আলাপ, খোলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মতো ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাসভরা!

অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়ো, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড়ো— কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তাহার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সংকোচ সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া ‘জ্যাঠা ছেলে’ বলে। নরোত্তম দাস বলেন— দাদু, তুমি আমার গৌর, — তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতোই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন — ওইরকম ভাবমাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়তো লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে। দাদু তাহলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে ‘প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা’-খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোট দু-খানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মরবার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাব দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতি-পথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে! তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি পাখি গাছপালা সাহচর্যের মতো অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল!

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচকুন্দ চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। সেগুলি সে বিছানায় রাখিয়া দেয়। তাহার পর সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টাখানেকের বেশি কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে, — আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলাধুলা সারাদিন সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার ক্লাস্ত দেহমনকে খেলাধুলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।



সেদিন তাহার দিদি চুপিচুপি বলে— চড়ুইভাতি করবি অপু?

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল— দাঁড়িয়ে দ্যাখ তেঁতুলতলায় মা আসচে কিনা — আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শিগগির করে।

একটা ভালো নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিন্মা করিয়া বলিল— শিগগির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু — সেইখানে রেখে আয়, দেখিস যেন গোরুটোরুতে খেয়ে ফেলে না।

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মতো ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল — এই দ্যাখ অপু, কত বড়ো বড়ো মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দোবো...

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বনভোজন। অপু এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত তরকারি রান্না হইবে, না খেলাঘরের বনভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সেরকম হইবে — ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠাল পাতার লুচি?

— কিন্তু বড়ো সুন্দর বেলাটি? বড়ো সুন্দর স্থান বনভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে শেওড়াগাছের ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দুর্বাঘাসের উপর খঞ্জুরী পাখিরা নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচিপাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবিলেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ির উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল— বিনির গলা যেন — নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপু পিছনে দুর্গার সমবয়সি একটি কালো মেয়ে আসিল — একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল— কী হচ্ছে দুর্গাদিদি?

দুর্গা বলিল - আয় না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি— বোস—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে সবু সবু কাচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সংকুচিতভাবে বাস করে। অবস্থাও ভালো নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কী না করিবে এবূপ





একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—
 বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ দ্যাখ্ তো — আগুনটা জ্বলচে না ভালো—

বিনি তখন কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুকনো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল— এতে হবে দুগ্গা দিদি — না আর আনব? ... দুর্গা যখন বলিল — বিনি এসেচে — ও-ও তো এখানে থাকে — আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু— বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল— কী কী তরকারি দুগ্গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা ছোবাতে তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে— ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মতো রং হচ্ছে দেখচিস অপু! ঠিক যেন মা-র রান্না বেগুনভাজা, না?

অপুর ব্যাপারটায় আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে তাহাদের বনভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুনভাজা সম্ভবপর হইবে! তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুনভাজা, আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা

সেদিকে চাহিয়া ছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে— কেমন হয়েছে রে বেগুনভাজা?

অপু বলে, — বেশ হয়েছে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষো মেটে-আলুর ফল ভাতে ও পানসে আধপোড়া বেগুনভাজা দিয়া চডুইভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময় মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনো আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুরতলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারি খাওয়া।

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন! বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্গাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম!

দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

অপু বলল— মাকে কী বলবি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর, মাকে কখনও বলি। সন্দের পর দেখিস খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়; তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দাও তো অপু? জল তেষ্ঠা পেয়েছে!

অপু বলিল— নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল — হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর-একদিন বনভোজন করব— কেমন তো?



১৭

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি রানুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলেমেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তাহার নাম টুনি। তাহার বাপও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্মস্থানে গিয়াছেন। ঘণ্টাখানেক পরে, সেজো ঠাকরুন ঘরে কী কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে গেল। সেজো ঠাকরুন দালানে আসিয়া বলিলেন—কী রে হাসি, কী?

টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিশের তলা হাতড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোশক উলটাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল— এই একটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুরের কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখানটায় রেখেচি, খোকা দোলায় চুঁচিয়ে উঠল, উনি বাড়ি থেকে এলেন— আর তুলতে

মনে নেই—কোথায় গেল আর তো পাচ্চিনে?—

সেজো ঠাকরুন বলিলেন— ওমা সে কী? হাতে করে নিয়ে যাসনি তো?

না দিদিমা, এইখানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজো ঠাকরুন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ির ছেলেমেয়ে ছিল, তারপর খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজো ঠাকরুনের ছোটো মেয়ে টেপি চুপি চুপি বলিল— আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম দুর্গাদি তখন দেখি যে খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মান্তর আবার এসেছে—

সেজো ঠাকরুন চুপি চুপি কী পরামর্শ করিলেন, পরে বৃক্ষসুরে দুর্গাকে বলিলেন— কৌটো দিয়ে দে দুর্গা, কোথায় রেখেচিস বল— বার কর এখুনি বলচি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজো ঠাকরুণের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কী বলিল ভালো বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই— একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, বিশেষত দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে সে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল—ও নেয়নি বোধহয় সেজদি—ও কেন—

সেজো ঠাকরুন বলিলেন— তুমি চুপ করে থাকো না! তুমি ওর কী জানো, নিয়েচে কী না নিয়েচে আমি জানি ভালো করে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের করে দে নয়তো কোথায় আছে বল— আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— আমি তো জানিনে কাকিমা— আমি তো—

সেজো ঠাকরুন বলিলেন— বল্লেই আমি শুনব? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেচি। আচ্ছা, ভালো কথায় বলচি কোথায় রেখেচিস দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও তো কিছু বলব না— আমার জিনিস পেলেই হলো—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা বল এখনও কোথায় রেখেচিস?...বলবিনে? না তুমি জানো না, তুমি খুকি—তুমি কিছু জানো না— শিগগির বল, নইলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলব এখুনি! বল শিগগির— বল এখনও বলচি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখচো না ওই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ— দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল,—কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুকনো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকিমা, ওরা সব চলে গেল আমিও তো— কথা বলিবার

সময় সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজো ঠাকরুনের দিকে চোখ রাখিয়া দেয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল — পাকা চোর—

টোপি বলিল — বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার জো নেই কাকিয়া—

শেষোক্ত কথাতেই বোধহয় সেজো ঠাকরুনের কোনো ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন — তবে রে পাজি, নচ্ছার, চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল কোথায় রেখেচিস — বল এখুনি — বল শিগগির — বল।

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজো ঠাকরুনের হাত ধরিয়া বলিল, করেন কী — করেন কী সেজদি—থাকগে আমার কৌটো—ওরকম করে মারেন কেন?—ছেড়ে দিন—থাক, হয়েছে, ছাড়ুন, ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল! পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন... এঃ রক্ত পড়ছে যে...

দুর্গার নাক দিয়া বার বার করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ করে নাই। বুকোর কাপড়ের খানিকটা রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন, — শিগগির একটু জল নিয়ে আয় টোপি — রোয়াকের বালতিতে আছে দ্যাখ—

চোঁচামেচি ও হইচই শুনিয়া পাশের বাড়ির কামারদের ঝি-বউরা ব্যাপার কী দেখিতে আসিল। রানুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে কামারবাড়ি বসিয়া গল্প করিতেছিলেন — তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কী দেখিল।

জল আসিলে রানুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে তেমন কিম্ব কিম্ব করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রানুর মা বলিলেন — অমন করে কী মারে সেজদি?...রোগা মেয়েটা — ছিঃ—

— তোমরা ওকে চেনোনি এখনও। চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই এই বলে দিলুম — মারের এখন হয়েছে কি — না পাওয়া গেলে ছাড়ব না কি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর —

রানুর মা বলিলেন — হয়েছে, এখন একটু সামলাতে দাও সেজদি— যে কাণ্ড করেচ —

টুনির মা বলিল — ওমা এত হবে জানলে কে কৌটোর কথা বলত?...চাইনে আমার কৌটো—ওকে ছেড়ে দাও সেজদি —

সেজো ঠাকরুন এত সহজে ছাড়িতেন কি না বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল। কাজেই তিনি আসামিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রানুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কির উঠানে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন — খুব ক্ষেণে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা আস্তে আস্তে যা — টোপি খিড়কিটা ভালো করে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারাভাবে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল।



গ্রামে বারোয়ারি চড়কপূজার সময় আসিল।

বাড়ি বাড়ি গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য গৃহস্থ বাড়ি হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চাল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চাল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়িতে এ দল কোনো বারই আসে না। দশ-বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্বরাতে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোটো খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে—এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুজ্যেদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রানি, পুঁটি, টুনা—এদের বাড়িতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মতো টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনা বলিল—আজ রাতে সন্নিহিতা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রানি বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ড নিয়ে আসবে—ছড়া বলতে বলতে আসবে—ওর সব মস্তুর আছে—

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুনবি বলব?

সগগো থেকে এল রথ

নামল খেতুলে

চব্বিশ কুটি বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—

সত্যযুগের মড়া আওল যুগের মাটি

শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্ঠবিহারের পুতুল হয়েছে নীলুদা?

...দাশু কুমোরের বাড়ি দেখে এলাম দেখিসনি রানু?

পুঁটি বলিল—সত্যিকারের মড়ার মুণ্ড রানুদি?

—নয় তো কী?...অনেক রাতে যদি আসিস তো দেখতে পাবি। চল ভাই আমরা বাড়ি যাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রানুদি? কী আজ হবে রাতে?...

রানু বলিল—সেসব কথা বলতে নেই—তুই আয় বাড়ি।

অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল।—তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ি ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কীসের যেন কটুগন্ধ বাহির হইতেছে। সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কীসের গন্ধ বেরিয়েছে ঠাকুমা?

বুড়ি বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা? তারই গন্ধ আর কী—

অপু বলিল—কারা ঠাকুরমা?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওদের নাম করতে নেই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোটো ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল—আমি কী করে বাড়ি যাব ঠাকুমা!

বুড়ি বকিয়া উঠিল—তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে?...

এসো আমার সঙ্গে। নীলপূজার থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন — ধন্য যা হোক—

বারোয়ারি তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ, বাঁশের সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়িতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে, বৈকালের আশায় থাকে। অপূর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাতে অপূর ঘুম হয় না, বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মতো কৌতূহল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছাস! বিছানায় ছটফট, এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে।

মায়ের বারণ আছে অত বড়ো মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল-নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে। অপূর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে দু-বেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজারার দলের যাত্রার মতো একটা অভূতপূর্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। একঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চলকাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে!....



কুমারপাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গোবুর গাড়ি তাহার চোখে পড়িল, সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ি — এক, দুই, তিন, চার, পাঁচখানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুনিয়া খুশির সুরে বলিল — অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি? সাজের গাড়িগুলোর পেছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে! পটু একজন দাড়িওয়ালাকে দেখাইয়া কহিল — এ বোধহয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ বাতাসের রং একেবারে বদলাইয়া গেল — অপু মহা উৎসাহে বাড়ি ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কী লিখিতেছে ও গুন গুন করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্মৃতি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ি বাবা! এরকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ি বিলি করিবার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কীসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এত বড়ো ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারিতলায় যাব বাবা, সকলে যাচ্ছে আর আমি এখন বুঝি বসে বসে পড়ব! এখুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে — পড়ো, পড়ো, এখন বসে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে? তখন না হয় যেয়ো এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সবসময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ি আসিয়া ছেলেকে চোখ-ছাড়া করিতে চায় না। অভিমানে রাগে অপূর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার ‘শুভঙ্করী’ শুরু করে — মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনি আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে? বছরকারের দিনটা — তোমার ন-মাস বাড়িতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তঞ্চালঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা?



অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারিতলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়িতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এসময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশি রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে, খোকা চট করে শিলেটে লিখে আনো দিকি, ঐঃ ভূত বাপরে!... অপু সব অদ্ভুত ধরনের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে বাবা এইটে হয়ে গেলে আমি কিন্তু চলে যাব...তাহার বাবা বলে — যেয়ো এখন, যেয়ো এখন খোকা — আচ্ছা চট করে লিখে আনো দিকি — আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহির হইতে কী একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন ছায়াভরা বৈকালে বাঁশবন ঘেরা বাড়িতে একা বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এসো পড়িতে বসো—অমনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হটগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না, এ হয় না! যাত্রা যে বসে বসে!... কোন উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায়, নিরীহ, দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে! বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল না আমিও দেখতে যাব। অপু বলে মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে? চিক দিয়ে ঘিরে দিয়েচে সেইখানে বসবে?

মা বলে—এখন থাক; ওই ওদের বাড়ির মেয়েরা যাবে, আমি তাদের সঙ্গে যাব—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারিতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসিহাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটো পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দু-হাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু-পয়সার মুড়কি কিনে খাস, নয়তো যদি লিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস।

ইহার দিনসাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল — তোর পুতুলের

বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল — কী হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল — নিচু খাব — কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেছে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু-বুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড়ো বড়ো, একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা! সতু কিনলে, সাধন কিনলে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল— আছে দিদি?

দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মতো ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারি মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুর্গা একটা কাজ কর তো! রানুদের বাগান থেকে দুটা সাদা গন্ধভেদালি পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেছে, একটু ঝোল করে দোব।

মায়ের কথায় সে একছুটে রানুদের বাগানে যায়—বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটি ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—

নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—



১৯

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই — শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে, ভালো বেহলাদার। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনও সে ভালো জিনিস শোনে নাই — উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে — মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়িতে সেই কী লিখিতেছে — দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথমে যখন জরির সাজপোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে রাজা মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনো লোক তো বাকি নাই! বাবা কেন এখনও...? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল — সে কী, আর এ কী! কী সব সাজ! কী সব চেহারা!...



হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে — খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো?...তাহার বাবা কখন আসরে আসিয়া বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে — বাবা দিদি এসেচে?...চিকের মধ্যে বুঝি?

মস্ত্রীর গুপ্ত যড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সংগত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোনো বনবাস গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনও দেখে নাই।

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রানি। ...ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোন ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোটো ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বন কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণ সাথি রে — শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী! ...যায়, বুঝি ঝাড়গুলো গুঁড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব ওঠে — ঝাড় সামলে — ঝাড় সামলে! কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল — সব বাঁচাইয়া চলে — ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরত-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে — ঘুম পাচ্ছে...বাড়ি যাবে খোকা?... ঘুম! সর্বনাশ! না সে বাড়ি যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে — এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেয়ো, আমি বাড়ি গেলাম। অপূর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কীসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে, অবাক কাণ্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুই-এ হাত দিয়া বলিল — এক পয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা...রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল — যাঃ অত পয়সা নেই — ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখলে আমাকে কী বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল — খাওয়াও না কিশোরীদা? আমি বুঝি কখনও কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপূর সমবয়সি হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড়ো সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে — বড়ো ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কীসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায় — একটু লজ্জার সঙ্কেত বলে — পান খাবে? ... অজয় একটু অবাক হয়, বলে — তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এসো না। দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে

এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে। তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনির মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর! ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ি কোথায় ভাই?... আমাকে একজনের বাড়ি খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়িতে খায় কে?...

খুশিতে অপূর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়িতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্ছে—তুমি কাল থেকে যেয়ো, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যেবাড়িতে আগে খেতে, সেখানে খাবে—

খানিকক্ষণ দুজনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পাঁট কেমন লাগচে তোমার?

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপূ বাড়ি আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার অ্যাকটো হইতেছে। বাড়িতে তাহার দিদি বলে—ও অপূ, কেমন যাত্রা শুনলি?...অপূর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কী বলিয়া উঠিল। কীসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! মহা খুশির সহিত সে বলে—কাল থেকে, অজয় যে সেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ি খেতে আসবে—

তাহার মা বলে—দুজনে খাবে?—দুজনকে কোথেকে—

অপূ বলে,—তা না, একজন তো চলে যাবে, শুধু অজয় খাবে—

দুর্গা বলে—কেমন যাত্রা রে অপূ?... এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্পে যখন সেই রাজকন্যে মরে গেল! অপূর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা সংগীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সূঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা—ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজনা তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরে বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপূর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারানি, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো। কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ওইরকম গায়ের রং, অমনি বড়ো বড়ো চোখ, অমনি সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোটোভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া এক নির্জন বনের মধ্যেই হারাইয়া গেল— সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপূর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুরবেলা খাইবার জন্য অপূ গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে



দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসি তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছরখানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশি কিছু নাই তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বলো না — সেই ‘কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথি রে’—

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল — অপু মুগ্ধ হইয়া গেল — সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্বজয়া বলিল — বিকেলে মুড়ি ভাজব, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেয়ো — লজ্জা কোরো না যেন — যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ির মতো, বুঝলে?



অপু তাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই তোমার তো গলা মিষ্টি — একটা গান গাও না? ... অপু খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরি লইবে। কিন্তু বড়ো ভয় করে — এ একজন যাত্রাদলের ছেলে — এর কাছে তার গান গাওয়া? নদীর ধারে বড়ো শিমুলগাছটার তলায় চলা-চলতির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশ ঝোপের আড়ালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান করে — শ্রীচরণে ভার একবার গা তোলো হে অনন্ত — দাশু রায়ের পাঁচালির গান বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক হইয়া যায়, বলে — তোমার এমন গলা ভাই? তা তুমি গান গাও না কেন? ... আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে — খেয়ার পাশে বসে রে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড়ো ভালো লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল — বাড়িতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল — এমন গলা থাকলে যে-কোনো দলে ঢুকলে পনেরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বলচি তোমায় — এর ওপর একটু যদি শেখো!

বাড়িতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে? গান হবে?...দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হউক, আজ একজন সংগীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কী বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল — তোমার ওই গানটা আমায় শেখাও না? — তাহার পর দুইজনে গলা মিশাইয়া সে গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ ছপ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল, কী খুঁজচে ভাই? অপু বলিল — ও ব্যাঙাচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে — তাহার পর বলিল — আচ্ছা ভাই, তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন?...যেয়ো না কোথাও, থাকবে?...

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপু কাছের রাজপুত্র অজয়। কোন বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে — চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কী করিয়া ছাড়া যায়!

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথি তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমািয়াছে। আর একটু বড়ো হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড়ো মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে — সেখানে বড়ো সুখ, রোজ রাতে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকি দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ি আসিবে ও সেসময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল — চলো ভাই, আজ আবার এখনি আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি ‘পরশুরামের দর্প-সংহার’ হয় তবে আমি নিয়তি সাজব, দেখো কেমন একটা গান আছে —

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুন্দর লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গোরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ি ডাকাইয়া যাহার যে গান ভালো লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান

ফরমাইশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন চারটা গান শিখিয়া ফেলিল। এক দিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভালো গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্য সাধনার পর নিজের বিদ্যা ভালো করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল — এসো না খোকা, দলে আসবে? অপূর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল! আরও সকলে মিলিয়া তাকে ধরে — এসো, চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপূর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রার দলে কাজ করা মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেখা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল — আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে?

অজয় বলিল — এখন এই সখী-ঠখী, কী বালকের পাট এইরকম, তারপর ভালো করে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড়ো হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য।

দিনপাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ির ছেলের মতো যখন তখন আসিত যাইত, এই কয় দিনে সে যেন অপূরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল! অপূরই বয়সি ছোটো ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাকে এ কয়দিনে অপূর মতো যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে — তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড়ো ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশি খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় দ্যাখে, কোথায় শোয়, কী খায়, ‘আহা’ বলিবার কেহ নাই গৃহ সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধহয় জন্মাবধি তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মতো সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

খাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভালো কাপড়—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বললে এই খুব হলো, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে বাড়ির দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাকে আগাইয়া দিতে আসিল। খাইবার সময় সে বারবার বলিয়া গেল দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ, আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে করতে। অপূর আমার যদি ওইরকম হতো—মাগো!...



প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড়ো উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে।

সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভালো চাকুরি দিবে। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অম্বরাত্রির মাথায় কোনো জরির পোশাকপরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগপত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোনো মণিখচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারেই একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয় কই?...

জীবন বড়ো মধুময় শুধু এই জন্য যে, মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সবসময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা, তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক তাহাদের আসন; তুচ্ছ স্বার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

এবার হরিহর যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ার একপাশে নিকনো-পুছানো ছোট খড়ের ঘর দু-তিনখানা। গোয়ালে হুঁপুঁপু দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচালি, গোলা ভরা ধান। মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখি ডাকে— নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড়ো মাটির ভাঁড়ে দোয়া একপাত্র তাজা সফেন কালো গাই-এর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। গরিব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

..... শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই রাত নাই, সর্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এককাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

দুর্গা একটা ছোট মানকচু কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হলো কী দুর্গা? আজ কী বলে ভাত খাবি? কাল সন্ধ্যাবেলাও তো জ্বর এসেছে? দুর্গা বলে, তা হোক সে জ্বর বুঝি — একটু তো মোটে শীত করল?... তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত —।

তাহার মা বলে — যাঃ, অসুখ হয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে। আজ কাল ভালো যদি থাকিস তো পরশু বরং দেবো!

অনেক কাকুতিমিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভালো আছি, আজ আর জ্বর আসবে না আমার—ওবেলা দু-খানা রুটি আর আলুভাজা খাব। একটু পরে হাই উঠে, সে জানে জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ! তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কী?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হু হু করে, ভাবে — জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি—

বাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজো ঠাকরুনদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায়ে পট করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হাঁটিয়া বাঁ পা-খানা যেখানে রাখিল, সে বাঁ পায়েও পট করিয়া আর একটা?সকালবেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সতু তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেলকাটা পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার!

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়া বাঙাল মুসলমান একটা বড়ো রং-চং করা কাচ বসানো টিনের বাস্ক লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ার জীবন চৌধুরির উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাস্কের গায়ে একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়া কী সব দেখিতেছিল।

বুড়া মুসলমানটি বাস্ক বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতি বাঘকা লড়াই দেখো! এক একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোং হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাকে মহা আশ্চর্যের সহিত জিগ্যেস করিতেছিল, কী দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

উঃ সে কী অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না। কী সে সব!

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকি?...দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ — আমার কাছে পয়সা নেই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকি, দেখে যাও — পয়সা লাগবে না —

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল, নাঃ — কিন্তু আশ্চর্য কৌতূহলে তাহার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিয়া উঠিল।



লোকটি বলিল—এসো এসো, দোষ কী?...এসো দেখো—

দুর্গা উজ্জ্বল মুখে পায়ে পায়ে বাস্কের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়ে তাকাও দিকি খুকি?

দুর্গা মাথায় উড়ন্ত চুলের গোছা পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কী করিয়া দেখা যায়? কত সাহেব, মেম, ঘর-বাড়ি, যুদ্ধ সেসব কথা সে বলিতে পারে না। কী জিনিসই সে দেখিয়াছিল!

অপুকে দেখাইতে বড়ো ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনো দিন আসে নাই।

গল্প ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ি নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার জোগাড় হইয়াছে। সকালবেলা সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে — ছেলের না নিকুচি করেছে — তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিক্কেয় উঠল? এবার বাড়ি এলে সব কথা বলে দেবো, দেখো এখন তুমি —

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলো খুব চারিদিকে ছড়ায়! মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো —

পরে সে বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের ভিজানো কালি চক চক করে — অপু মহাখুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে! ভাবে — আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে — ওঃ, কী চক্চক্ করচে দেখো একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড়ো একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুকাইতে দিয়া কতটা আজ জ্বলজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয় — আচ্ছা, যদি আর একটু দি?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল ডালা ডালা খয়ের রোজ দরকার — রেখে দে খয়ের —

ধরা পড়িয়া একটু অপ্ৰতিভ হইয়া বলে, খয়ের নইলে কালি হয় বুঝি?...আমি বুঝি এমনি এমনি —

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্মা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্প পরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্মার নারদের বরে পুনর্জীবন-প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে মূলত কোনো অংশেই পৃথক নহে।

দপ্তরে একখানা বই আছে, — বইখানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে একখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানাতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ওই রকম হইতে চায়। হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেঘপালক ডুবাল ইত্যন্ত সঙ্করগণশীল মেঘদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ওইরকম হইতে চায়। ‘বীজগণিত’ কী জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মতো। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কী শুব্জকরী এসব তাহার ভালো লাগে না। ওইরকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কী বেড়ার ধারে বসিয়া সে ‘ভূচিত্র’ (জিনিসটা কী?) পাতিয়া পড়িবে,

বড়ো বড়ো বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ওইরকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সেসব জিনিস? কোথায় বা ‘ভূচিত্র’, কোথায় বা ‘বীজগণিত’ কোথায় বা ল্যাটিন ব্যাকরণ? — এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্থা, আর তৃতীয় নামতা।

মা বকিলে কী হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?



২১

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার অমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোট পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সে অনেক দিন হইয়া গেল — রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খবর আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস বলে দেখতে পাসনে, ডাক-বাক্সটার কাছে বসে থাকবি — পিওন যেমন আসবে আর অমনি জিজ্ঞেস করবি —

অপু বলে — বা, আমি বুঝি বসে থাকিনে? কালও তো এল পুঁটিদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল — জিজ্ঞেস করে এসো দিদি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কী করে এল? আমি থাকিনে বই-কি?

বর্ষা রীতিমতো নামিয়াছে। অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে! সাধু কর্মকারের ঘরের চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিশে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া দ্যাখে। আকাশের ডাককে সে বড়ো ভয় করে। বিদ্যুৎ চমকাইলে মনে মনে ভাবে — দেবতা কীরকম নলপাচ্ছে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাকবে — পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

বাড়ি ফিরিয়া দ্যাখে মা ও দিদি সারা বিকালে ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড়ো করিয়াছে।

অপু বলে — কোথেকে আনলে? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে — কত —! উঃ উঃ! তোমার তো বসে বসে বড়ো সুবিধে! ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে — এই এতটা এক হাঁটু জল? যাও দিকি?

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবি বাহির করিয়া বলে, এই দ্যাখো জিনিসখানা, খুব ভালো — ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে — এ যে সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দান — এখন এ জিনিস আর মেলে না —

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বউ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া রেকাবিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে — সর্বজয়া এ অনুরোধ বারবার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পুবে হাওয়া, খানাডোবা সব থই-থই করিতেছে — পথে ঘাটে একহাঁটু জল, দিন রাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে বাড় বাধে — বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে — আকাশের কোথাও ফাঁক নাই — মাঝে মাঝে আগেকার চেয়েও অন্ধকার করিয়া আসে — কালো কালো মেঘের রাশ হু হু উড়িয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে।

মহাঝড় !

দিন রাত সোঁ-সোঁ শব্দ — নদীর জল বাড়ে — কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল। নদী নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে — গোরু-বাহুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ির ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখি পাখালির শব্দ নাই কোনোদিকে ! আর অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণ ! — অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল — আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি ?

দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল, না উঠিয়াই বলিল — কতখানি জল এসেচে রে ?

অপু বলে, তোর জ্বর সারলে কাল দেখে আসিস। তেতুলতলার পথে হাঁটু জল ! পরে জিজ্ঞাসা করে — মা কোথায় রে ?

ঘরে একটা দানা নাই — দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে, — তা হবে না মা, আমার খিদে পায় না বুঝি — আমি দুটি ভাত খাব — হুঁউ —

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মানিক আমার — ওরকম কী করে। অনেক করে চাল ভাজা মেখে দেব এখন — রাঁধব কেমন করে, দেখচিস নে কীরকম স্বেঁণ্টা করেচে ? উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে ? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কী বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে — এই দ্যাখ একটা কইমাছ, বাঁশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেড়াচ্ছে — বন্যার জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাং থেকে — বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে কী না ? তাই সব উঠে আসছে —

দুর্গা বলে — একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসব এখন ! পরে সে অবাক হইয়া ভাবে — বাঁশবাগানে মাছ। কী করে এল ? বাঃ তো ! — মা কী আর ভালো করে খুঁজেচে। খুঁজলে আরও সেখানে আছে — দেখতে পেলাম না কীরকম কই মাছ কানে হাঁটে — কাল সকালে দেখব — সকালে জ্বর সেরে যাবে —

চারিদিকে বন-বাগান ঘিরিয়া সম্প্রদায় নামে। সম্প্রদায় মেঘে ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার ! দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে।

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায় ! অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসে — ঠান্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে — মা — কী ? সেই — শ্যামলজ্জ্বা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ ?

দুর্গা বলে — ততক্ষণে মা আমায় ছেড়ে গিয়েচেন দেশ —

অপু বলে — দূর — হাঁ মা তাই ? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ ? কথা বলিয়াই সে দিদির অঙ্গতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকো ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মতো বেঁধে। মনে মনে ভাবে — সাতটা নয় পাঁচটা নয় — এই তো একটা ছেলে — কী অদেষ্ঠ যে করে এসেছিলাম — তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে — ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না — কি না। শুধু দুটো ভাত — নিনকি! আবার ভাবে — এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার — অপু মানুষ হলে আর দুঃখ থাকবে না — ভগবান তাকে মানুষ করে তোলেন যেন।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এইরকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখ্যজ্যোবাগানের কাছে খড় বোঝাই নৌকা পর্যন্ত আসিয়াছিল।

অপু বলে— কত বড়ো নৌকা মা?

মস্ত ওই যে চুনের নৌকা, সাজিমাটির নৌকা মাঝে মাঝে আসে দেখিচিস তো — অত বড়ো— দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?

অনেক রাতে সর্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায় — অপু ডাকিতেছে — মা, ওমা ওঠো — আমার গায়ে জল পড়চে —

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে— বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে — ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে — তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে — দুর্গা— ও দুর্গা শুনহিস? একটু ওঠ দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি — ও দুর্গা — শিগগির, একেবারে ভিজে গেল যে সব —

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত— এই ঘন বর্ষা তাহার মন ছমছম করে — ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে ... কিছু ঘটিবে। ভাবে — সে মানুষেরই বা কি হলো? কোনো পত্তরও আসে না — ঢাকা মরুকগে যাক। এরকম তো কোনোবার হয় না? তাঁর শরীরটা ভালো আছে তো? মা সিন্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভালো খবর এনে দাও মা।

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাটার বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যের ছোটো ডোবাটা জলে ভরতি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল — ও নিবারণের মা, শোন — পরে সলজ্জভাবে বলিল — সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে — তা নিবি?

নিবারণের মা বলিল — আছে? দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে করে এখনি আসব এখন — নতুন আছে মা-ঠাকরোন, না পুরোনো?

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না — এখুনি দেখবি? একটু পুরোনো কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয়নি- ধোয়া তোলা আছে — পরে একটু থামিয়া বলিল — তোরা আজকাল চাল ভানহিস নে?

নিবারণের মা বলিল — এই বাদলায় কি ধান শুকোয় মা-ঠাকরন?... খাবার বলে দুটোখানি রেখে দিইচি অমনি —

সর্বজয়া বলিল — এক কাজ কর না—তাই গিয়ে আমায় আধকাঠাখানেক আজ দিয়ে যাবি? একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল — বৃষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনবার লোক পাচ্ছি নে — টাকা নিয়ে বেড়াচ্ছি, তা কেউ যদি রাজি হয়— বড়ো মুশকিলে পড়িচি মা।

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল,— বলিল — আসব এখন নিয়ে কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা ঠাকরন?... বড্ড মোটা—

নিমছাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে — এক পয়সার বিস্কুট আনিয়া দেবে মা, নোনতা, মুখে বেশ লাগে?

সাবু তাই জোটে না, তায় বিস্কুট!



২২

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশি করিয়া আসে।

বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না। দরজা জানালা দিয়া ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট হু হু করিয়া ঢোকে — ছেঁড়া থলে ছেঁড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙা কবাটের আড়ালের সাধ্য কী যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশি রাতে সকলে ঘুমাইলে বেশি বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না — সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুস হুস জলের শব্দ।

জীর্ণ কোঠাখানা এক একবারের দমকায় যেন থর থর করিয়া কাঁপে... ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়... গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লইয়া নিঃসহায়!

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না — কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে — নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে — শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

একবার বড়ো একটা দমকায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল... বৃষ্টির ছাঁটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল।

আতঙ্কে সর্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল — আচ্ছা, যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কী অন্য কোনো জানোয়ার? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই — মাগো। জলের

ছাঁটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে... হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপূর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে— সে কী করে? আর কত রাত আছে? — সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে — ও অপূ, ওঠ তো? শুনছিস, ও অপূ? ওঠ দিকি! দুর্গাকে বলে — পাশ ফিরে শো তো দুগ্গা। বড্ড জল পড়ছে — একটু সরে পাশ ফের দিকি—

অপূ উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায় — পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কী শব্দ হয়, — সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল — বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে — রান্নাঘরের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছে?... তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে— এইবার বুঝি পুরানো কোঠাটা —? কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে— হে ঠাকুর, আজকের রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর ওদের মুখের দিকে তাকাও —

তখনও ভালো করিয়া ভোর হয় নাই, বড় থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী গোহালের গোরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কিদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন — নতুন বউ! সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল— ন-দি, একবার বট্ঠাকুরকে ডাকো দিকি? একবার শিগগির আমাদের বাড়িতে আসতে বলো— দুগ্গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন — দুগ্গা? কেন কী হয়েছে দুগ্গার?

সর্বজয়া বলিল — কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল — হচ্ছে আবার যাচ্ছে— ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্দেশ থেকে জ্বর বড্ড বেশি — তার ওপর কাল রাতে কীরকম কাণ্ড তো জানোই— একবার শিগগির বট্ঠাকুরকে —

তাহার বিশ্রান্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী বলিলেন — ভয় কী বউ — দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি — চলো আমি যাচ্ছি — কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল বাবা, কাল রাত্তিরের মতো কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি — শেষরাতে সব উঠে গোরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কী না?... দাঁড়াও আমি ডাকি —

একটু পরে নীলমণি মুখুজ্যে, তাহার বড়ো ছেলে ফণী, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপূদের বাড়িতে আসিলেন।

দুর্গার বিছানার পাশে অপূ বসিয়া আছে, নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন — কী হয়েছে বাবা অপূ? — অপূর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কী সব বকছিল জ্যেষ্ঠামশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন — দেখি হাতখানা?... জ্বরটা একটু বেশি, আচ্ছা কোনো ভয় নেই — ফণী, তুমি একবার চট করে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে — একেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন — দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়াশব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এং, ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল পড়ে কাল রাতে ভেসে গিয়েচে... তা বউমার লজ্জার কারণই বা কী — আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হতো?



একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন — দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই। জ্বর বেশি হইয়াছে, মাথায় নিয়মিতভাবে জলপটি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই— তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুজ্যে দু-বেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়-বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড়ো বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল — ও দিদি শুনছিস, কেমন আছিস, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে, কী যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু মুখের কাছে কান লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, টিঁ টিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভালো করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কী বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল — বেলা কত রে?

অপু বলিল — বেলা এখনও অনেক আছে — রোদ্দুর উঠেছে আজ দেখিচিস দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েছে—

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপূর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন অপু— একটা কথা শোন—

— কীরে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল!

— আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?

— দেখাব এখন— তুই সরে উঠলে বাবাকে বলে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাব রেলগাড়ি করে—

সারা দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনোকালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুজ্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শিগগির— অপুদের বাড়ির দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ব্যাপার কী দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন!

সর্বজয়া মেয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে— ও দুগ্গা চা দিকি— ও মা ভালো করে চা দিকি—ও দুগ্গা—

নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন— কী হয়েছে— সরো, সব সরো দিকি — আহা কী সব বাতাসটা বন্দ করে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাসুর সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল — ওগো, কী হলো, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না!

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে— পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে— পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূর পারে কোনো পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড়ো অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল— বলিলেন — ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কী— খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল করে — ঠিক এরকম একটা case হয়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধ ঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।



২৩

হরিহর বাড়ির চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়াছিল। গোয়াড়িতে কিছু দিন থাকিবার পর সে সম্ভান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়িতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ি হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হইল না।

সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাই— খোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল, পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুল্লি স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড়ো অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্মা লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা মারে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হই হই করিয়া কাটায়।

অতি কষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড়ো বড়ো উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটা টানিয়া লইয়া কে একজন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। একদিন প্রাতে সেক্রেটারিবাবু নিজ বাড়িতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভায় তিনদিনের বেশি থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত-মুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই— সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয় গান করিয়াছিল — গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয় — সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না — মাত্র দিন দশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুইমাসের উপর হইয়া গেল —এপর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই — এতদিন কী করিয়া তাহাদের চলিতেছে! অপু বাড়ি হইতে আসিবার সময় বারবার বলিয়া দিয়াছে — তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড়ো ভালোবাসে — মাঝে মাঝে সে বাপের বাক্স-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে, বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে — কোন বই বাবা বাক্সের কোথায় রাখে, ছেলে তাহা জানে না — উলটাপালটা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে— হরিহর বাড়ি ফিরিয়া বাক্স খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্তি।

তাহার বাড়ি হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে— অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল — রোজ রোজ পড়ে — কুচুনিপাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িতে তাহার ভারি আমোদ — হরিহর বলে — বইখানা দ্যাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্ছে যে। অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে — এই শর্তে বাবাকে রাজি করাইয়া তবে সে বই ফেরত দেয়। আসিবার সময় বারবার বলিয়াছে — সে বই একখানা এনো কিন্তু বাবা, এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভালো দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সেসব তো দূরের কথা, কী করিয়া বাড়িতে সংসার চলিতেছে

সেই না এখন সমস্যা? সন্ধ্যার পর পূর্বপরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে রাত্রের মতো আশ্রয় লইল।

ভালো ঘুম হইল না —বিছানায় শুইয়া বাড়িতে কী করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের
গোলাতেই একদিন



একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বর্ধিষু মহাজন গৃহ-দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে বরাবর টুকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাড়ির কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ি যাইবার সময় বাড়ির কর্তা দশ টাকা প্রণামি ও যাতায়াতের গাড়িভাড়া দিলেন, গোয়াড়িতে রক্ষিত মশায়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামি পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মল আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সরস সবুজ লতাপাতায়, পথিকের চরণভঙ্গিতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ির বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই বাড়ির কথা মনে হয়।

রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালোবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভালো কাপড়, ভালো দেখিয়া আলতা কয়েক পাতা। অপূর ‘পদ্মপুরাণ’ অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা ‘সচিত্র চণ্ডী মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান’ ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালির টুকটাক দু-একটা জিনিস — সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল একটা কাঠের চাকি-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড়ো একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন হন করিয়া উদবিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে লক্ষ না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল

— উঃ দেখো কাণ্ডখানা, বাঁশ ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে

পাঁচিলের ওপর, ভুবনকাকা কাটাবেনও না — মুশকিল

হয়েচে আচ্ছা — পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া

অভ্যাসমতো আগ্রহের সুরে ডাকিল— ও মা দুগ্গা —

ও অপু—



তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল, — বাড়ির সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো — ঘরে এসো। স্ত্রী-র অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না — তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে — এখনই ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিবে — দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে — কী বাবা এর মধ্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের ‘সচিত্র চণ্ডীমাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান’ ও টিনের রেলগাড়িটা দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিবে! সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কাঁঠালের চাকি-বেলুন এনিচি এবার — পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কই — অপু, দুগুগা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে —

সর্বজয়া আর কোনোমতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল — ওগো দুগুগা কী আর আছে গো — মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে — এতদিন কোথায় ছিলে!



২৪

গাঙগুলি বাড়ির পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতি বড়ো দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদি বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট সময়ে কুমার আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকার সাজ জোগায়, বারাসে-মধুখালির দ হইতে বাউরিরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে।

আঁসমালির দীনু সানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মতো রসুনচৌকি বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনির আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে। নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানি অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোটো মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা গিয়েচে বাবা—।

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল! শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতেই সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানা স্থানে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোটো ছেলে



সুনীল। বড়ো ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পারিবে না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড়ো ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিনদশেক বাড়ি রহিল। সুরেশ অপূরই বয়সি, ইংরাজি ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সুরেশের চালচলন ও কথাবার্তার ধরন এমনি যে সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশি উঁচু। সমবয়সি হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁষে না।

অপু এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়িতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙুলিদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গিতে এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন করিতেছিল। অপুকে বলিল — বলত ইন্ডিয়ার বাউন্ডারি কী? জিয়োগ্রাফি জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কী কষেচ? ডেসিমেল ফ্র্যাকশন কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটিতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্ম পদ্ধতি, একখানা পুরোনো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত — এই সব। সে ওই সব বই পড়িয়াছে, — অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়, — ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এবিষয়ে বিকারের রোগীর মতো তাহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মতো সংগতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশি লেখা-পড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ি থাকে নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেকে এটা-ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায। সে বহুদিন হইতে ‘বঙ্গবাসী’-র গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো ‘বঙ্গবাসী’ তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড়ো হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সমস্তে বান্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই ‘বঙ্গবাসী’ কাগজখানার জন্য কীরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধুলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে — হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা জোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টনটন করে।

পূর্ণিমার দিন রানিদের বাড়ি সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রানি তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল — আমাদের বাড়ি তো আগে কত আসতিস, আজকাল আসিসনে কেন রে?

— কেন আসব না রানুদি — আসি তো?

রানু অভিমানের সুরে বলিল, হ্যাঁ আসিস! ছাই আসিস। আমি তোর কথা কত ভাবি। তুই ভাবিস আমার, আমাদের কথা?

—না বই কী! বারে—মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো দিকি?

এছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ত তাহার জোগাইল না। রানি তাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল, প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল! হাসিয়া বলিল — থালা সুস্থ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়িমার কাছ থেকে নিয়ে আসব—

রানির মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা নির্ভরতার ভাব আসিল অপূর।

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—রানুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না! একখানা দেবে পড়তে? পড়েই দিয়ে যাব।

রানি বলিল—কোন বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, অবশেষে বলিল— আচ্ছা পড়তে দিই, যদি এক কাজ করিস। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে— জ্যেঠামশায় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুরবেলা চৌকি দিতে, — আমার সেখানে একা একা ভালো লাগে না, তুই যদি যাস আমার বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রানি প্রতিবাদ করিয়া বলিল — বেশ তো? ও ছেলে মানুষ সেই বনের মধ্যে বসে চৌকি দেবে বইকি? — যাও তোমায় বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো —

অপু কিন্তু রাজি হইল। রানির বাবা ভুবন মুখুজ্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার অনেক দেরি অথচ এই বইগুলোর উপর তাহার বড়ো লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুপ্তচিন্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু-একখানা একটু আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, কাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সংকটময় মুহূর্তটিতেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে — রেখেদে অপু, এসব ছোটোকাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারি হইতে বাছিয়া এক একখানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলো শেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় শুইয়া একমনে পড়ে।

এক একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া ওঠে, রগ টিপ টিপ করে; পুকুরধারের নির্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোনদিক দিয়া বেলা গেল।

বাড়ি আসিলে তাহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চৌকি দিস গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে বসে একখানা বই পড়িবার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে!

কিন্তু বোকা অপূর লাভ যেদিক দিয়া আসে তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নাই!



সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল — দেখো তো খোকা, কী বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল — খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারি ঘোষের শাশুড়ির নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু-টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোনোমতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হ্যাঁ-খবরের কাগজ বটে। সেই বড়ো বড়ো অক্ষরে, ‘বঙ্গবাসী’ কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাচ্চটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত! খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কীসব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কী অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড়ো বড়ো পাতায়?

হরিহরের মনে হয়—দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোনো বন্ধকি মাকড়ি খালাসের আত্মপ্রসাদ মোটেই বেশি হইত না!

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে—দ্যাখো বাবা, একজন ‘বিলাত যাত্রী’-র চিঠি বেরিয়েচে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেচে — না বাবা?

একদিন রানি বলিল—তোর খাতায় তুই কী লিখচিস রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন খাতায়? তুমি কী করে —

—আমি তোদের বাড়ি সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়িমার সঙ্গে কতক্ষণ বসে কথা বললাম। কেন খুড়িমা তোকে বলেনি? তাই দেখলাম তোর বই-এর দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কী সব লিখচিস—আমার নাম রয়েছে, আর দেবী সিংহ না কী একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কী গল্প রে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রানি একখানা ছোটো বাঁধানো খাতা অপূর হাতে দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে একটা



গল্প লিখে দিস— একটা বেশ ভালো দেখে। দিবি তো? অতসী বলছিল, তুই ভালো লিখতে পারিস নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাব।

অপু রাতে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে— আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ।

তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটো দু-পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধব কী দিয়ে? এইখানে রাঁধছি, এই আলোতে বসে পড়ো।

অপু ঝগড়া করে।

মা বকে—এং, ছেলের রাত্তির হলে যত লেখা-পড়ার চাড়া—সারাদিন—চুলের টিকিটি দেখবার জো নেই। সকালে করিস কী? যা তেল দেবো না।

অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড়ো হলে আমি ওকে ভালো দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ি উঠবে। আসচে বছর পঁয়তেরা দিয়েইনি, তারপর গাঙুলিবাড়ির পুজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

...চার পাঁচদিন পরে সে রানির হাতে খাতা ফিরাইয়া দিলে। রানি আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস?

অপু হাসি হাসি মুখে বলিল — দেখো না খুলে?

রানি দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওং অনেক লিখেচিস যে রে! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই!

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরও কিছু— ইস! এসব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইং, বই দেখে বইকি? আমি তো গল্প বানাই— পটুকে জিজ্ঞেস করো দিকি অতসীদিদি ওকে বিকেলে গাঙের ধারে বসে বসে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রানি বলিল—না ভাই, ও লিখেছে আমি জানি! ও ওই রকম লেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে। পরে অপুকে বলিল —নাম লিখে দিসনি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন! ‘সচিত্র যৌবনে-যোগিনী’ নাটকের ধরনে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কীরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলেও রানুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই সেখানা ফেরত দিয়াছে।

মাছ ধরিবার শখ অপুর অত্যন্ত বেশি। সোনাডাঙা মাঠের নীচে ইছামতির ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটিতে গিয়া নদীতীরে একটা বড়ো ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারি ভালো লাগে, একেবারে নির্জন, দু-ধারে নদীর পাড়ে কতকী গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম শিমুল গাছ, বেগুনি রং-এর বনকলমি ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখির ডাকে, বনের ছায়ায়, উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জনতা!

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠির-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কী মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাতনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে এদিকে ওদিকে ছটফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখির বাসার খোঁজে ফিরিয়া আসিয়া হয়তো চোখে পড়ে ফাতনা একটু একটু ঠুকরাইতেছে!

এক একদিন সে এক একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের নিকট হইতে সে একখানা নীচের ক্লাসের ছবিওয়ালা ইংরাজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে শুধু ছবি দেখে! দূর দেশের কথা ও সকলরকম মহত্বের কাহিনি ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড়ো দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে ধরনের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষারঝড়িকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিস্টোফার কলম্বাস কীরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন— এমনি সব গল্প।

স্যার ফিলিপ সিডনির ছোট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে— সুরেশদা, গল্পটা জানো তুমি? বড়ো করে বলো না?

সুরেশ বলে—ও জুটফেনের যুদ্ধের কথা!

অপু অবাক হইয়া বলে—কী সুরেশদা? জুটফেন! কোথায় সে?

সুরেশ ওইটুকুর বেশি আর বলিতে পারে না।...

সে সুরেশদার ইংরাজি ম্যাপে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বৃকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুণ্ঠতরাজ। জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন প্রদেশের অন্তঃপাতি এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক দুহিতা পিতার মেঘপাল চরাইতে যায়, আর সুনীল নয়ন দুটি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী-মনে উদয় হইল, কে তাহাকে বলিতেছে—তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড়ো করো, অস্ত্র ধরো, দেশের জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে! দেবী মেরি তাহার উৎসাহদাত্রী—দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তাহার পর নবতেজোদৃগু ফরাসি সৈন্যবাহিনী কী করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কী করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইল, তাহার পর অজ্ঞানান্ধ লোকে কী করিয়া তাঁহাকে ডাইনি অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটা ভাবিতে ভাবিতে কী অপূর্বভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়!— কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা সে তত ভাবে না। কিন্তু যে ছবিটি তাহার বারবার মনে আসে তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছ বিচরণশীল মেঘদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথায় উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তশ্রোত, — অপর দিকে এক সরলা, দিব্যভাবময়ী পল্লীবালিকা। ছবিটা তাহার প্রবর্তমান বালক-মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে! কতদূরে নীল সমুদ্রে ঘেরা মার্টিনিক দ্বীপ। চারিদিকে আখের খেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু বহু দূর—শুধু নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র।—শুধু নীল আর নীল। আরও কত কী, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ির দিকে যাইবার জোগাড় করে।

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল খিল করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল—তাকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধরতে এইছিস, তাই এলাম। মাছ হয়নি?... একটাও না? চল বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

দুজনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট-ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাতে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠান্ডা আর্দ্রগন্ধ উঠিতেছে, কলমি শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে ধারে চাষিরা পটলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙশালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পূব আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তুপ।

পটু বলিল—অপুদা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল—সেটা নয়! বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভালো গানের। সেইটে গাইব, আর এটু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওইসব লোক রয়েছে— এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপুদা। কোথায় লোক রয়েছে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দূর, ধর সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। পটু বাঁশের চটায় বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুই এ চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে; নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, শ্রোতে আপনা আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড়ো বাঁকের দিকে চলে। অপূর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দূরে আসে নাই হঠাৎ পটু ঈশান কোণের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ও অপুদা, কীরকম মেঘ উঠেছে দেখছিস? এখুনি ঝড় এল বলে—নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল—হোকগে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে গান গাইতে লাগে ভালো, চল আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল; তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেক দূরে সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখির কলরব শোনা গেল, ঠান্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাবলা ও বড়ো বড়ো ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘসারি বাঁধিয়া উড়িয়া পালাইল।

অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মতো উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল।

পটু বলিল—বড্ড মুখর বাতাস অপুদা, সামনে আর নৌকা যাবে না। কিন্তু যদি উলটে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে করে আনি।

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেন না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না। সে নৌকার গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে সম্মুখের ঝটিকান্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল! তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের ভূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরিপানার দাম সব যেন মুছিয়া যায়! নিজে কে সে ‘বঙবাসী’ কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্র মাঝের কত অজানা ক্ষুদ্র দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেল বনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূরচক্রবালে রাখিয়া সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে!—চলিয়াছে!

সে ওইসব জায়গায় যাইবে, ওইসব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্য-যাত্রা করিবে, বড়ো সওদাগর হইবে, অনবরত, দেশে-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড়ো বড়ো বিপদের মুখে পড়িবে; এ কথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কী করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে! আর দিনকতক পরে বাড়ি বাড়ি ঠাকুর পূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভালো কাপড়, ভালো জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়সম্পদহীন পল্লী বালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?

কিন্তু এসকল কথা তাহার মনে ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড়ো হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে... এখন শুধু বড়ো হইবার অপেক্ষা মাত্র। সে বড়ো হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ-জানার, মানুষ-জানার, মানুষ-চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙিন ভবিষ্যৎ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকি পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে; নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশ বনের পথে উল্লাসে শিস দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলে।



আসলে অপু কিছু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়াছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রে মায়ের সঙ্গে বাবার যে সব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এ দেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে।



জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সেসব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই,—দুঃখ এদেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড়ো তক্তাপোশ, সিঁদুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদার আসিয়া সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরের দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে, সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্ৰণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু আছেই বা কী দেশে যে থাকতে বলব—তাছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোটো হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে চন্দ্রনাথটা সেরে আসব, যদি ভগবান দিন দেন—

রানি কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। অপুকে বলিল—হাঁরে অপু তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রানুদি, জিপ্তেস করো মাকে—

তবুও রানি বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রানি অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল — কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আসবি নে আর কখনও?

রানির চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড়ো ভালো গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কী করে?

অপু বলিল— আমি কী করব, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাব রানুদি, বড়ো হলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রানি বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও করে দিলি নে, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রানি দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রানুদি মিছামিছি কেন রাগ করে। সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপূর কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপূর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। স্নানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট কাটলাম, একদিন মাছ ধরবিনে তাতে?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব, অসংযত আনন্দে অপূর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এসময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপূর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোনো দ্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরি বুড়ি মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরি বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরি ডাইনির ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল—তখন সে ছোটো ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরি বুড়ি ডাইনি নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গরিব, অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল এক হাঁড়ি শুকনা আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ি আমসি আমচুর তৈয়ারি করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপূ তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আমসি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো অপূ, একখানা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস? অপূ প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পানসে পুতু পুতু পট তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারব না, যা—কেন রামরাবণের যুদ্ধ একখানা কেনো না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ—ছেলের যা কাণ্ড! কেন ঠাকুর-দেবতার পট বুঝি ভালো হলো না? দিদির শিল্পানুভূতি শক্তির উপর অপূর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিরা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখির ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কলমির ফুলের দুলুনিতে—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর! আর কখনও, কখনও—সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।

মেলার গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশি বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড়ো ভালো লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল—মালপাড়ার হারান মাল এক বাড়িল বাঁশের বাঁশি টাটিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন স্বরূপ একটা বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপূ জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক পয়সা? হারান মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা

করিল—তোমরা নাকি শোনলাম খোকা গাঁ ছেড়ে চলে? তা কোথায় যাচ্ছ—হ্যাঁগা? অপু দেড় পয়সা দিয়া সবু বাঁশের বাঁশি একটা কিনিল। বলিল, কোন কোন ফুটোতে আঙুল টেপো হারানকাকা? একবার দেখিয়ে দাও দিকি?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা রঙিন কাপড় জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ি পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখি, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা, রং করা হাঁড়ি, ছোবা—সকলেরই হাতে কোনো না কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনি ফুলুরির দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দু-পয়সার তেলেভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না। মনে মনে ভাবিল—সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বলব, আমি মেলা দেখব বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চলো যাই—না হয় দু-দিন এসে খুড়িমাদের বাড়ি থেকে যাব?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জ্যেষ্ঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক চিক করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপূর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্নবিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি কবুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়িঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগির আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড্ডুই ভাতি করার ওই জায়গাটা—এসব সে কত ভালোবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কী তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কী সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্নাবরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশপাঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কী সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার সায়েবের ঘাটের মতো ঘাট কি সে দেশে আছে? রানুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীরতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপূ ঘরের মধ্যে তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কী লওয়া যাইতে পারে না পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। উঁচু তাকের উপর একটা কলসি সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর একটা কী জিনিস গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। ধুলা ও মাকড়সার বুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট সোনার কৌটাটা, আর বছর যেটা সেজো ঠাকরুনদের বাড়ি হইতে চুরি গিয়াছিল!

দুপুরে কেহ বাড়ি নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মতো কানে আসে। আপন মনে বলিল— দিদি হতভাগী চুরি করে ওই কলসিটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়কি-দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুপ্তায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রদের বেদনা করুণ মধ্যাহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরের ডাক দিলে যে ঘন বন-ঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহারই পাশে রাশীকৃত শুকনা বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈঁচিঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কী মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হিবু গাড়েয়ানের গোরুরগাড়ি রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ, প্রচুর বৈশাখী-মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছপালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ির পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপুদা, এবার বারোয়ারিতে ভালো যাত্রাদলের বায়না হয়েছে, তুই শুনতে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশি করে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্ন-স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারো মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভালো হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সেসব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও-বা মাটির প্রদীপ টিম টিম করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কী মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ি হইতেছে আতুরি বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড়ো খেজুর-বাগানের পাশ দিয়া গাড়ি গিয়া একেবারে আষাঢ় যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা।

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ি তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল।



সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড়ো মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ, শিমুল বাবলা গাছ, খেজুর গাছে খেজুরের কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বউ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূর প্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রঙের মতো গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু-নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছ-পালা-বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মতো দূর হইতে দূরে আপন মনে বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন প্রাচীনকালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখনি পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়িতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলা শেষের স্বপ্নপটে আবার কত কী শৈশব কল্পনার আসা যাওয়া! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে! এখন হয়তো কোথায় কতদূরে চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব জীবন!

বাংলার বসন্ত, চৈত্র-বৈশাখের মাঠে, বনে বাগানে, যেখানে সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাকে, নবপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লাসে আনন্দন্ত্য শুরু করিয়াছে। এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল।

রাত্রি প্রায় দশটায় সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ি পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ি স্টেশনে পৌঁছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়া ছিল, গাড়ি থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সম্ভ্রা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারারাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ওই হিরু গাড়োয়ানের গোরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনই সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট সাজানো—দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্স মতো দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডান্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কী করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক চিক করিতেছে। ওদিকে রেললাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেইরকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপর চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। একরাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট খড়মের বউলের মতো জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট খট শব্দ করিতেছে।

ইস্টিশান! ইস্টিশান! বেশি দেরি নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ি শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবেও!

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মতো জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁধিয়া খাইবার জোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ি পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বউ ও একটি যুবক। অপু শুনিল বউটি হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বউটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ির চালডাল ধুইতেছে, বউটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ি দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসিও লোকজনদের হটাইয়া দিতেছিল।

কত বড়ো ট্রেনখানা! কী ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইঞ্জিন বলে? উঃ, কী কাণ্ড!

হবিবপুরের বউটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়াছিল।

গাড়িতে হই হই করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ির মেজেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানালা দরজা সব হুবহু! এই ভারী গাড়িখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপূর হইতেছিল না। কী জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ি আজ আর চলিবে না! তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, অপূর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ি চড়িল না সে বাঁচিয়া থাকিবে কী করিয়া? হিরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ি চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া-থাকা হিরু গাড়োয়ান সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সটসট করিয়া দু-দিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ি! উঃ মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে। ঝোপঝাপ, গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি ছোটো-খাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ির তলায় জাঁতা-পেয়ার মতো একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কী শব্দটা!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগনালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে।

অনেকদিন আগের সে দিনটা।

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠজলা ভাঙিয়া উর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন—আর আজ?

ওই যেখানে আকাশের তলে আষাঢ় দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে

উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন স্নানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে বাঁশবনে আমতলায় সে দিদিকে যেন এত দিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালোবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়া দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপূর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল! তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কী সে জানে না। কত কী মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে... আতুরি ডাইনি...নদীর ঘাট... তাহাদের কোঠাবাড়িটা... চালতেতলার পথ... রানুদি... কত বৈকাল, কত দুপুর... কতদিনের কত হাসি-খেলা... পটু... দিদির মুখ... দিদির কত না-মেটা সাথ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে...



পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক-ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে —

সত্যই সে ভুলে নাই!

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোনো নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল-সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মতো মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এইসব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরোনো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়ীংগায়ের গরিব ঘরের মেয়ের কথা—

অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগনালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।





হাতে কলমে

১. অতি সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- ১.১ কুঠির মাঠ দেখতে যাবার পথে কী দেখে অপু সব থেকে বেশি অবাক হয়েছিল?
- ১.২ আলকুশি কী?
- ১.৩ ‘এই দ্যাখো মা আমার সেই মালাটা’— কে, কখন এই কথা বলেছে?
- ১.৪ অপু কার পাঠশালায় পড়তে গিয়েছিল? গুরুমশাই পড়ানোর পাশাপাশি আর কোন কাজ করতেন?
- ১.৫ পাঠশালা কখন বসতো? কজন ছাত্রছাত্রী ছিল?
- ১.৬ আতুরি ডাইনি কে? বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্কে অপুর ধারণা বদলে গেলো কীভাবে?
- ১.৭ লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে অপু যে আশ্চর্য ভ্রমণকাহিনি শুনিয়েছিল তা লেখো।
- ১.৮ অপু কড়ি খেলতে কোথায় গিয়েছিল? তার সঙ্গীসাথি কারা ছিল লেখো।
- ১.৯ ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ বইটিতে মানুষের ওড়ার ব্যাপারে কী লেখা ছিল?
- ১.১০ ‘আমি মরবার সময় বইখানা তোমায় দিয়ে যাব দাদু।’— কে, কাকে একথা বলেছিলেন? কোন বইখানি দিয়ে যাবার কথা ছিল?
- ১.১১ অপুর দপ্তরে কী কী বই ছিল? কোন মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে অপুর মন নানা কল্পনায় ভরে উঠত?
- ১.১২ ‘দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনো দিন আসে নাই।’— কোন খেলার কথা বলা হয়েছে, লেখো।
- ১.১৩ অপু বসে বসে খাতায় কী লেখে?
- ১.১৪ অপুর টিনের বাস্তুতে কী কী বই ছিল?
- ১.১৫ ‘তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি?’— কে, কাকে এ কথা বলেছে? কোন গাঁয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে?
- ১.১৬ ‘রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?’— কী রইল? এখানে কোন জিনিসের কথা বলা হয়েছে?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো:

- ২.১ দুর্গা-অপুর খেলাধুলোর সরঞ্জাম বলতে কী ছিল লেখো।
- ২.২ অপূর পাঠশালাটি কেমন ছিল?
- ২.৩ আশ মিটিয়ে যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করার জন্য অপূ কী করত?
- ২.৪ দুর্গা তো পাঠশালায় যেতো না, তার সারাদিন কীভাবে কাটত, লেখো।
- ২.৫ বাছুর খুঁজতে বেরিয়ে দুর্গা-অপূ কীভাবে পথ হারিয়ে ফেলেছিল?
- ২.৬ রাজকুমার সান্যালের দেশভ্রমণের গল্পগুলি কেমন ছিল?
- ২.৭ ‘একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা’।— অপূর জীবনের সেই নতুন অভিজ্ঞতাটি কী?
- ২.৮ দুর্গা-অপূ কীভাবে রেলের রাস্তা দেখার চেষ্টা করেছিল?
- ২.৯ ‘বাঁকা কঞ্চি অপূর জীবনের এক অদ্ভুত জিনিস।’— এ কথা বলার কারণ কী? সামান্য উপকরণ নিয়ে খেলার আনন্দ সম্পর্কে লেখো।
- ২.১০ শূন্যে ওড়ার ক্ষমতা অর্জনের জন্য অপূ কী করেছিল?
- ২.১১ ভুলো কুকুরকে নিয়ে দুর্গা কীভাবে আমোদ উপভোগ করত?
- ২.১২ বৃন্দ নরোত্তম বাবাজির সঙ্গে অপূর কীভাবে ভাব হয়েছিল?
- ২.১৩ অপূ-দুর্গার চড্ডাইভাতির আয়োজন সম্পর্কে লেখো। এখনকার পিকনিকের সঙ্গে এরকম চড্ডাইভাতির তফাৎ কোথায়?
- ২.১৪ অজয় কে? তার সঙ্গে অপূর বন্ধুত্ব হল কীভাবে?
- ২.১৫ অপূ তার দিদির সঙ্গে কেন কখনও আড়ি করবে না?

৩. নীচের প্রশ্নগুলি নিজের ভাষায় বিশদে লেখো:

- ৩.১ বাবার সঙ্গে অপূর কুঠির মাঠ দেখতে যাবার অভিজ্ঞতাটি লেখো। ‘কুঠিবাড়ি’ বলতে তুমি কী বোঝো?
- ৩.২ ছবি-দেখে-চেনা কোনো কিছু হঠাৎ চোখের সামনে চলে এলে কেমন লাগে? অপূর খরগোশ দেখার মতো তোমার হঠাৎ অবাক হবার মতো কোনো ঘটনা লেখো।
- ৩.৩ কালবৈশাখী ঝড়ে দুর্গা-অপূর আম কুড়ানোর ঘটনাটি লেখো। ঝড়বৃষ্টিতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে তা উপভোগ করার তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা লেখো।
- ৩.৪ যে দিন অপূ প্রথম পাঠশালা গেল সেদিনের কথা লেখো। তোমার প্রথম স্কুলে যাবার দিনটি মনে পড়ে? সেদিনের কথা তোমার যা মনে আছে লেখো।

- ৩.৫ ‘অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই’—
‘পথের পাঁচালী’তে দুর্গা আর অপু নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে থেকেই কীভাবে বারে বারে অচেনার
আনন্দ অনুভব করেছে লেখো।
- ৩.৬ হরিহরের সঙ্গে মহাজনবাড়িতে গিয়ে অপু কীভাবে প্রথম নিজেদের দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতন
হলো, লেখো।
- ৩.৭ দুর্গা-অপুর যে নানান খেলার কথা উপন্যাসে আছে সেগুলির কথা লেখো। হার-জিত
আছে এমন খেলার সঙ্গে এ জাতীয় খেলার তফাৎ কী? তুমি কী ধরনের খেলা পছন্দ করো
এবং কেন তা লেখো।
- ৩.৮ মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে অপুর কর্ণের চরিত্র বড়ো ভালো লাগে কেন?
- ৩.৯ মহাভারতে তোমার প্রিয় চরিত্র কোনটি? কেন তাকে তোমার ভালো লাগে, লেখো।
- ৩.১০ ‘সে জগৎ জানার, মানুষ জানার, মানুষ চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে’ — কার কথা বলা হয়েছে?
ভবিষ্যতের যে রঙিন স্বপ্নে সে বিভোর তার কথা লেখো।

